প্রথম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অরণ্য ও আরণ্যক জীবন

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-''বঙ্কিম বঙ্গ-সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদঘাটিত হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তে অনুভব করিতে পারিলাম । কোথায় গেল সেই অন্ধকার , সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিষয়বস্তু, সেই গোবেলকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা-- কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।.....''[১]

বাংলা উপন্যাস বিশ্ব-উপন্যাসের মানে পা বাড়ালো যাঁর সুশিক্ষিত হাত ধরে তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিষয়-বৈচিত্র্যে,মনস্তত্ত্বে,জীবনের নানান টানাপোড়েনে, তত্ত্বে ও তথ্যে, এবং সর্বোপরি শৈলী ও ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুললেন । রবীন্দ্রনাথ অকপটে স্বীকার করলেন -''আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন । একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম-সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল, বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন । পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত তাহা আজ বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিনী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে ।.....''[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপনাসের প্রতিষ্ঠা। তাঁর হাতে বাংলা উপন্যাস প্রথম একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ হিসেবে গড়ে উঠল। উপন্যাসকে বাস্তব জীবনের রূপায়ণ করতে হয়। বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রাণ। আর তার আর একটি বিশিষ্ট উপাদান মানবজীবন কথা। মানুষের জীবনের বাস্তবচিত্র রচনাই তার কাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রথম থেকেই স্থান পেয়েছে কল্পনামূলক জীবন রচনা। উপন্যাসের প্রথম থেকেই তিনি অতীতের পট ব্যবহার করে তাকে আলোকিত করে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর লেখায় বাস্তব জীবন চিত্রনের চেয়ে বেশি জোর পড়েছে মানুষের আদর্শায়িত জীবন রূপায়ণে।

বাস্তবের তুলনায় আদর্শ, বর্তমানের তুলনায় অতীত - তাঁর উপন্যাসে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

মৌন অতীতের অন্ধকারকে তিনি কল্পনার আলোয় উজ্জ্বল করতে গিয়েছেন। এই অতীতের পট গড়েছে ইতিহাস, আর তাকে সহায়তা করেছে রহস্যময়ী অরণ্য। অরণ্য আর ইতিহাস তাঁর লেখায় অঙ্গাঙ্গী জড়িত। অতীতের ইতিহাসকে রোমাঞ্চময় করেছে অরণ্যের নিবিড় রহস্যময়তা। অরণ্য ছাড়া অতীতের রূপ চিত্রনে তিনি এনেছেন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ মোগল রাজপুতের স্থানিক চিত্র। যে দুর্গে তিলোত্তমার অধিষ্ঠান, যে গৃহে ক্ষুদ্র রাজপুত রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর উপস্থাপনা, যে অরণ্যের ভগ্নগৃহে প্রফুল্লের ভবিষ্যৎ দেবী চৌধুরানী হয়ে ওঠা - এসবই তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের কল্পনাকে বিস্ময়কর রহস্যময়তা এনে দিয়েছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে অরণ্য আর ইতিহাস অতীতের দুই অঙ্গী।

বঙ্কিম-উপন্যাসের পটভূমি রচনায় অরণ্য কখনো গাঢ় , কখনো কোমল ছায়া ফেলেছে। অরণ্য প্রভাবিত করেছে বিভিন্ন চরিত্রকে । কখনো চরিত্রগুলি সারল্য-সহজতায় নিষ্পাপ সুন্দর হয়ে উঠেছে, কখনো অরণ্য সংগ্রামীদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে । দুর্ভেদ্য জঙ্গল কখনো আবার রহস্যঘন হয়ে উঠেছে ।

১৮৫৮ সালের ৭ই আগস্ট থেকে ১৮৯১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৩৩ বছরের কর্মজীবনে মধ্য, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের প্রায় পনেরো-ষোলোটি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল কাছ থেকে দেখবার দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল। এই প্রশস্ত স্থানিক-অভিজ্ঞতা তাঁকে অবশ্যই বহুবার অরণ্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে । দেখা মিলেছে আরণ্যক মানুষদেরও। যদিও বিভূতিভূষণের যে ব্যক্তিগত অফুরান আরণ্যক-অভিজ্ঞতা ছিল তা বঙ্কিমের ছিল না । তাই বিভূতিভূষণের মতো অরণ্যই প্রধান চরিত্র হয়ে আসেনি তাঁর উপন্যাসে। অরণ্য সেখানে আবহ রচনা করেছে । রাশভারী বঙ্কিমের ভেতরেও ফল্গুধারার মতো যে প্রকৃতিপ্রেম বহমান ছিল তা হঠাৎ কখনো প্রকাশ পেয়ে গেছে। যদিও তাঁর সৃষ্টিতে তাকে তিনি প্রধান হয়ে উঠতে দেননি।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'-তে অরণ্য অবধারিতভাবে এসেছে। অরণ্য না থাকলে এই অসামান্য উপন্যাসের পরিকাঠামোই গড়ে উঠতো না। এই উপন্যাস গড়ে তুলবার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকটা কাজ দিয়েছে। ১৮৬০ সালের ২১শে জানুয়ারী মেদিনীপুরের নেগুঁয়া মহকুমাতে(বর্তমানের কাঁথি মহকুমা) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে তিনি যোগ দেন।[৫] এ বছরেরই ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত তিনি এখানে ছিলেন। কাঁথির কাছাকাছি দরিয়াপুর ও চাঁদপুর। এ অঞ্চলে প্রচুর বনজঙ্গল ছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির সেই নিটোল সৌন্দর্য্য, সরলতা ও রহস্য তাঁর শিল্পী-মনকে প্রভাবিত করলো। লেখকের ছোটভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন--

''যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমা (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন , তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত । যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন , তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত । চাঁদপুরের কিছুদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল । বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত ।''[৬]

বনচারী এই কাপালিক বঙ্কিমচন্দ্রের মনে দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করে গেলেন । নেগুঁয়া থেকে বদলি হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় যাচ্ছেন, তখন কদিন কাঁটালপাড়ায় তিনি থাকেন। সেসময় প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্র-এর কাছে তিনি জানতে চান --

''যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয় , কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?''[৭] বোঝা যায় তখন বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্লোকে কপালকুন্ডলার নির্মাণপর্ব চলছিল। যে অরণ্যকে দূর থেকে তিনি দেখেছেন তারই রহস্যময়তা তাঁর মনে এক আরণ্যক নারী-চরিত্রের জন্ম দিচ্ছিল। যদিও বঙ্কিমের এই প্রশ্নের জবাব তাঁর দাদা সঞ্জীবচন্দ্র খুব হালকাভাবে দিয়েছিলেন

''কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামীপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে,সন্ন্যাসীর প্রভাব তাঁহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।'' এই উত্তর বঙ্কিমের মনঃপুত হয়নি। কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন --

''ভাবগতিকে বুঝিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের একথা মনোমত হইল না। দীনবন্ধু কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। ইহার পত দুই বৎসরের মধ্যে 'কপালকুন্ডলা' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিক-প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিনী, বনচারিনী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।''[৬]

বঙ্কিম-কল্পনার এই অনন্যা আরণ্যক নারীকে বাস্তবের সংস্পর্শে আনবার জন্যই যেন 'নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জিত হইলেন।'[৭] তাঁকে বনবাসে বিসর্জন দিয়ে তাঁর সঙ্গীরা চলে গেলেন। আর -

''তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যত দূর দৃষ্টি চলে তত দূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র । কিন্তু সে বন দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে , কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ মন্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখন্ড ব্যাপিয়াছে ।''[৮]

সহযাত্রী-পরিত্যক্ত নবকুমারের কাছে অরণ্যময় নির্জনতা খুব একটা গ্রহণযোগ্য হয়নি প্রথমে । বঙ্কিম-লেখনীতে তা এমন -

''যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয় । পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন ছিল না , অরণ্যময় মাত্র । কিন্তু বাঙ্গালাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য

ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূণ্যা ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমন্ডলকারী বৃক্ষাদির মধ্যে ঝাটী,বনঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক। এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গীগণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।''[১৯]

এই পরিত্যক্ত একাকিত্বে স্বভাবতই অরণ্যের সবুজ হাতছানি নবকুমারের নাগরিক-মন-কে টানতে পারে নি। বরঞ্চ উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও ভয় তাঁর মনকে গ্রাস্ত করে তুলছিল। তিনি বুঝলেন''এইতুষারশীতল-বায়ুসঞ্চারিত-নদীতীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে, নিরাশ্রয়ে, নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবেক। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা। প্রাণনাশই নিশ্চিত।''[২০]

অরণ্যের ভয়াবহতাই যে নবকুমার বেশী জানতেন, তাই গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে যখন দেখলেন --''এখনও যে তাহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কিনা।''[২১] তারপর অরণ্যের মাঝখানে আলো দেখতে পেয়ে 'বৃক্ষলতা দলিত করিয়া, বালুকাস্তূপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। ' আরণ্যক কাপালিকের সঙ্গে এভাবেই তাঁর দেখা। কাপালিকের পর্ণকুটীর-এর যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তাও আরণ্যক আদিম সন্ন্যাসীদের বাসস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয় -- 'ঐ কুটীর কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে--এক কলস জল ও কিছু ফলমূল আছে।'[২২] এই পর্ণকুটীরে পর্ণপাত্র রচনা করে কলস থেকে 'ঈষতিক্ত জল' পান করতে হয়, খাদ্য বলতে বনজ ফলমূল। শুতে হয় বাঘের চামড়া পেতে।

প্রথম দিনের স্বজন-পরিত্যক্ত হবার আকস্মিকতা, ক্লান্তি, ক্ষুধা, উদ্বেগ নবকুমারকে অরণ্য-সচেতন হবার অবকাশ দেয়নি। জীবনের তাগিদে অরণ্যকে তাঁর আশ্রয় করতে হয়েছে। পরের দিন মানসিক স্থিতি কিছুটা এলেও প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি অরণ্য-গভীরে বেরিয়ে এলেন। ফলান্বেষণে বেরিয়ে অরণ্যের গোলকধাঁধায় পড়লেন। বঙ্কিমচন্দ্র তার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন -

''...তৎপরে বালুকাবিহীন বনমধ্যে পড়িলেন। যাহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন,তাঁহারা জানেন যে,পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন

পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।.....''[১৩] আর এই উদভ্রান্ত পথভ্রান্তির মধ্যেই কপালকুন্ডলা যেন অরণ্যের প্রতীক হয়েই হঠাৎ মৃদুস্বরে বলে উঠলেন--'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?' আরণ্যক-পটভূমিকায় এই প্রশ্ন যেন অরণ্যের অন্তর থেকেই উঠে এল। বঙ্কিমচন্দ্র এর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন -

''....এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল , যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল , বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল , সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল । সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী , রমণী সুন্দরী , ধ্বনিও সুন্দর , হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।''[১৪]

আসলে কপালকুন্ডলা অরণ্যের নির্যাসেই তৈরী। তাই তার সৌন্দর্য্য যে অরণ্যের সৌন্দর্যেরই সমার্থক। নাগরিক নবকুমার আরণ্যক কপালকুন্ডলার দেহজ রূপে প্রথমে মুগ্ধ হলেও তার প্রতি সন্দিগ্ধও ছিলেন। তাই--

''তাই অমাবস্যার ঘোরান্ধকার যামিনীতে দুই জনে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্য পথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত । কেবল সহচারিনী যোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বত্মসিধর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। মনে মনে ভাবিলেন-- 'এও কপালে ছিল।''[১৫]

অথচ এই অরণ্যবাসিনী বালিকাই নবকুমারকে কাপালিকের বলিদানের খড়্গ থেকে বাঁচিয়ে মুক্তির পথে নিয়ে চলছিলেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। নবকুমারকে বাঁচিয়ে নিজে কিভাবে বাঁচবে তা কপালকুন্ডলা একবারো ভাবেনি। অরণ্যের কোলে আজন্ম নিস্পাপ তার জীবনযাপন। বৃক্ষরাজির মতোই নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রত তাঁর জীবনচর্যায়। এই কপালকুন্ডলাকে নাগরিক জটিলতায় নিয়ে এল নবকুমার। যেন অরণ্য থেকেই একটি গাছকে আমূল তুলে নিয়ে গেল নগরে। কিছুটা রমণী-সৌন্দর্যের তাড়নায়, কিছুটা কৃতজ্ঞতায়। আর এখানে অলক্ষ্যেই এসে পড়ল আরণ্যক জীবন ও নগর জীবনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তাই জীবনে নারীত্বের পূর্ণ সুখ পেয়েও, নিজস্ব পরিচিতি পেয়েও , নিজস্ব সংসার পেয়েও অরণ্যের জন্যই অরণ্যকন্যার মন কাঁদতে লাগল। তাই ননদ শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃবধূ কপালকুন্ডলাকে প্রশ্ন করলেন- ''তবে শুনি দেখি , তোমার সুখ কি ?'' গৃহী তপস্বিনী অকপটে উত্তর

দিলেন--''বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।''[১৭] সপ্তগ্রামে স্বামিগৃহে এসেও কপালকুন্ডলার মন আসলে পড়ে থাকতো সেই অরণ্যেই। এখানে বাড়ীর ছাদটা তাঁর অবকাশের সঙ্গী হল। কারণ 'নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটি খাল বহিত : সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।' এই বন যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতো। আর খালটি এনে দিত অরণ্য-ছোঁয়া সমুদ্রের আস্বাদ। কপালকুন্ডলা দেখতেন--'সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে একদিকে নিবিড় বন ৎ তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।'[১৮]

অরণ্য কপালকুন্ডলাকে দিয়েছে নিষ্কলুষ সারল্য। পার্থিব লোভ তাঁর চরিত্রে আসেনি। আরণ্যক জীবনে তা আসার সুযোগও ছিল না। তপস্বিনীর মতোই শুদ্ধ তাঁর চিত্ত। তাই নির্দ্বিধায় এক অপরিচিত ভিক্ষুকের হাতে দিয়ে দিতে পারেন মতিবিবির দেওয়া যাবতীয় অলঙ্কার। লোভী ভিক্ষুক এই অভূতপূর্ব দানে বিহ্বল হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে--'ভিক্ষুক দৌড়িল কেন ?'[১৯]

এই অরণ্যই কপালকুন্ডলাকে আবার চরম ট্রাজেডীর দিকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল। ননদ শ্যামাসুন্দরীর কাছে স্বামীকে বশ করে রাখবার ওষধির কথা জেনে তাই বুঝি কপালকুন্ডলা নিমেষে বলে ওঠেন-- ''আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও দেখে এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।''[২০] অরণ্য কপালকুন্ডলার কাছে আপনজনের মতো। তাই এ নিয়ে তাঁর দ্বিধা, সংশয় কিছুই নেই। তাই তিনি অরণ্যে চললেন ওষধির খোঁজে। নগরছোঁয়া এই অরণ্য হঠাৎ তাঁকে বিবাহপূর্ব আরণ্যক স্মৃতি ফিরিয়ে দিল--

''গ্রামের কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুন্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে ওষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীণা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধ রশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত-মেঘখন্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে, পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ,

187319 07 MAY 2006

লতাসকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্রসকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে। নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।পশু পক্ষী নীরব।কেবল কদাচিৎমাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ, কোথাও ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুক্কুররব। এমৎ নহে যে,একেবারে বায়ু বহিতেছিল না, তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল, কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামা লতা দুলিতেছিল, কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চরী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুখন্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্ব্বসুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

''কপালকুন্ডলার সেইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল।.....''[১৯]

এখানে অরণ্য-বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত নিখুঁত, বিশেষতঃ রাতের রহস্যঘন অরণ্য-বর্ণনায়। সপ্তগ্রাম-সন্নিহিত অরণ্য কপালকুন্ডলার অরণ্য-চেতনাকে আবার জাগিয়ে তুললো। 'কাননতলে' শীর্ষক এই নৈশ অরণ্যপর্বে প্রবেশ করার আগে অবধারিতভাবেই যেন বঙ্কিম জন কীটস-এর চারটি পংক্তি বেছে নিয়েছেন--

"Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays;
But here there is no light."[২০]

এতকাল পরে অরণ্যের সান্নিধ্য কপালকুন্ডলার অন্তর্লোকে মোহময় জাল বিস্তার করছিল। ওষধির খোঁজে তিনি যে বনে এসেছেন, তাই তিনি ভুলে গেলেন। একদিন অরণ্য-গভীরে আলো দেখে নবকুমার যেমন মোহাবিষ্ট এগিয়ে চলেছিলেন, এখন কপালকুন্ডলা তেমনি এগিয়ে চললেন-- ''অন্যমনে যাইতে যাইতে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, কপালকুন্ডলা তাহা ভাবিলেন না। যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল, ক্রমে আর পথ দেখা যায় না।পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুন্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এই নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে।-- কপালকুন্ডলা পূর্ব্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে গেলেন। দেখিলেন, যথায় আলো জ্বলিতেছে,তথায় কেহ নাই। কিন্তু তাহার অনতিদূরে বননিবিড়তা হেতু দূর হইতে অদৃশ্য একটি ভগ্ন গৃহ আছে।''[২১]

আরণ্যক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিজ্ঞতায় কপালকুন্ডলার মনে অরণ্য সম্পর্কে কোনো ভয় আসেনি। এমনকি রাতের ছায়াময়তাতেও। তবে অরণ্যের বাইরের জীবন তাঁকে কিছুটা বদলে তো দিয়েছিলই। তাই ব্রাহ্মণবেশধারী নবকুমারের প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী (ওরফে লুৎফা উন্নিসা) যখন কপালকুন্ডলাকে প্রশ্ন করলেন--'তুমি কে?' তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করতে পারলেন না। ''যদি এক বৎসর পূর্বের হিজলীর কেয়াবনে কপালকুন্ডলার প্রতি এ প্রশ্ন হইত, তবে তিনি তৎক্ষণেই সঙ্গত উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন কপালকুন্ডলা কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, সুতরাং সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না।''[২৫]

হয়তো এই 'তুমি কে?'-এর উত্তর কপালকুন্ডলার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন নিজেকে। যাকে রেখে এসেছেন চাঁদপুরের সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী অরণ্যে। তাই যখন পদ্মাবতী তাঁর স্বামীকে ফিরে পাবার তাড়নায় কপালকুন্ডলাকে দূরে চলে যেতে বললেন, লোভ দেখালেন--''তোমাকে অট্টালিকা দিব-ধন দিব-দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে'', তখন কপালকুন্ডলা শান্ত অথচ স্পষ্টভাবে বললেন--''অট্টালিকা,ধন,সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক- কালি হইতে বিঘ্নকারিনীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।''[২৬]

কিন্তু এই অরণ্যে প্রত্যাবর্তন-এর শান্তি কপালকুন্ডলার জীবনে আসেনি। আসলে কপালকুন্ডলার অরণ্য ও কাপালিকের অরণ্য-এর মধ্যে দুস্তর ফারাক। একজন অপার স্নিগ্ধতায় সৌন্দর্য্যে সারল্যে ভালোবাসায় আরণ্যক হয়ে উঠেছেন, অন্যজন অরণ্যকে তাঁর সাধনক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অরণ্য তাঁর চরিত্রে সারল্য দেয়নি, স্বভাবজাত ক্রূরতাই বোধহয় তার জন্য দায়ী। নরহত্যাকে তিনি অরণ্য দিয়ে লুকোতে চেয়েছেন। কপালকুন্ডলার মধ্যে অরণ্যের শ্রী শোভা ও সৌন্দর্য্য, আর রোমান্টিকতা। অন্যদিকে কাপালিকের মধ্যে অরণ্যের ক্রূরতা ভয়ালতা ও নিষ্ঠুরতা। নবকুমার আছে তার মাঝখানে। সে কপালকুন্ডলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ। কিন্তু কপালকুন্ডলার মতো সারল্য নবকুমারের নেই। সে সংসারী মানুষ। তার সাংসারিক মন এই সরলতাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেনি। এরফলে নবকুমার কখনো সন্দেহ করে, কখনো উন্মত্তের মতো আচরণ করে, কখনো বলে 'আমাকে রাখো মৃন্ময়ী'। বঙ্কিম যেন অরণ্য আর নগর দুয়ের একটা ঐক্য রচনা করতে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি।

সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন --''বঙ্কিম সাধারণতঃ নগর-জীবনকে তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেননি। নগর জীবনাপেক্ষা শান্ত প্রকৃতি, উদ্বেল করোজ্জ্বল নদীবক্ষ, খদ্যোত সমাকুল ঘোর নিশীথিনী, ফুল, গাছ, পাখি বঙ্কিমের কল্পনায় সাড়া তুলেছে অনেক বেশী। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে যে, মানব-জীবনের ওপর প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাবকে বঙ্কিম-ই প্রথম বাংলা সাহিত্যে যথার্থ রোমান্টিকের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন।''[২৬]

'কপালকুন্ডলা'র সমগ্র কাহিনী জুড়ে অরণ্য-প্রকৃতির অনায়াস অবস্থান এবং তা রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন। এই উপন্যাসের উল্টো মেরু-র উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এও অরণ্য অব্যর্থভাবে এসেছে। আমরা জানি 'আনন্দমঠ' শুধুমাত্র একটি উপন্যাস নয়, আমাদের জাতীয় জীবনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালীদের এক হাতে থাকতো গীতা, আরেক হাতে 'আনন্দমঠ'। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাস একসময় স্বদেশীদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। এই উপন্যাস-অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম' গানটি স্বাধীনতা আন্দোলনে মন্ত্রের মতো সম্মান পেয়েছে। হাজার-হাজার যুবক-যুবতী 'বন্দেমাতরম'বলে দেশের জন্য চরম আত্মোৎসর্গের জন্য নির্দ্বিধায় এগিয়ে গেছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসে অরণ্য একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। অরণ্য এখানে সংগ্রামী সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল, তাদের সাম্রাজ্য - যেখান থেকে তারা মুক্তির স্বপ্ন দেখে। অরণ্যের গভীরে তারা চরম কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। 'আনন্দমঠ' শুরুই হয়েছে এই অরণ্যের বর্ণনা দিয়ে। 'উপক্রমণিকা'য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন -''অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূণ্য, ছিদ্রশূণ্য, আলোকপ্রবেশের পথমাত্রশূণ্য, এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে, নীচে ঘনান্ধকার।মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখনো মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

''একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য,তাহাতে রাত্রিকাল,রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।-পশুপক্ষী এমেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায় - শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

''সেই অন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধমধ্যে শব্দ হইল 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?' শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল, তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল ?কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল,আবার সেই নিস্তব্ধ মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল 'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?' ''[১১]

অরণ্যের রহস্যময়তায়, গভীর রাতের অন্ধকারে এভাবে 'আনন্দমঠ'-এর সূচনা হয়েছে। এক সন্ন্যাসী-সেনা তাঁর জীবনসর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য উদগ্রীব। আরণ্যক অন্ধকারের মতোই অচেনা মনে হয় তাঁর কণ্ঠস্বর, যা নির্জন অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে মুহূর্তের জন্য হলেও ভেঙ্গে দেয়। আর এই আকস্মিক রহস্যময়তাই পাঠককে উপন্যাসের ভেতরে টেনে নিয়ে যায়।কল্যাণীর সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-ও পৌঁছে যান সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে।

১১৭৬ সাল। বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর দুর্ভিক্ষপীড়িত। খাদ্য নেই,জল নেই। 'পদচিহ্ন' গ্রামের ধনবান মহেন্দ্র সিংহ, তাঁর স্ত্রী কল্যাণী ও শিশুকন্যাকে নিয়ে শহরের দিকে চললেন, বাঁচবার আশায়। ক্ষুধানিপীড়িত মানুষ তখন পশুর মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে। সারাদিন হেঁটে তারা একটি 'চটী'তে পৌঁছলেন, অভুক্ত শিশুর জন্য মহেন্দ্র যখন দুধের খোঁজে গেলেন, তখন কল্যাণী দস্যুদের কবলে পড়লেন। তাঁকে ও বাচ্চাটিকে ক্ষুধার্ত্ত দস্যুরা জঙ্গলে নিয়ে এল। ক্ষুধার ভয়াবহ জ্বালায় মানুষগুলো নরমাংস খাবার জন্যই লোলুপ হয়ে উঠল। তাদের দৃষ্টি পড়ল কল্যাণী ও তাঁর সন্তানের দিকে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে দস্যুদের বিবাদের সুযোগ নিয়ে কল্যাণী তাঁর কন্যাকে নিয়ে পালালেন। এভাবে তিনি বনের গভীরে প্রবেশ করলেন। পিছনে দস্যুরা তাড়া করছে - যেন উদ্যত মৃত্যু। অন্যদিকে অরণ্য তার অন্ধকার কোল পেতে দিয়েছে কল্যাণী ও তাঁর কন্যাকে

আড়াল করবার জন্য। অরণ্য-ই যেন এখানে কল্যাণীর ত্রাতা। 'আনন্দমঠ' উপন্যাস শুরু হয়েছে রাতের অরণ্য দিয়ে, এর মূল কাহিনীও শুরু হয়েছে রাত্রিবেলার অরণ্য দিয়েই।

''বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না। বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল। মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিবৃত্ত হইবে, কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল - ভিতরে বনের অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকারসকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতরে লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল - কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরুপ্ত হইয়া মআর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূণ্য তৃণময় স্থানে বসিয়া, কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, ''কোথায় তুমি ! যাঁহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাঁহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন !''[১৮]

অরণ্যের গভীরে তাঁর আরাধ্য দেবতার করুণার জন্য আকুল কল্যাণী 'বনান্ধকার মিশ্রিত চন্দ্ররশ্মিতে' দেখলেন একজন 'শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তি' দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষুধার্ত্ত দস্যুদের হাতে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি ও তাঁর কন্যা মুক্তি পেলেন। এভাবেই কল্যাণী আশ্রয় পেলেন 'গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে' একটি মঠে, যা সন্ন্যাসী-বিদ্রোহীদের 'আনন্দমঠ'। অরণ্য তার দুর্ভেদ্য

রহস্য দিয়ে যেন এই সন্ন্যাসীদের আগলে রেখেছে, যাঁরা একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহান ব্রতে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের আরাধ্য দেবী হলেন 'জগদ্ধাত্রীরূপিনী মাতৃভূমি', আর আরাধনা-সঙ্গীত হল 'বন্দেমাতরম'। ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে যখন আনন্দমঠে নিয়ে এলেন তখন এই দেশমাতৃকার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন -

''ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রকৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বলঙ্কারভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী, ইহাকে প্রণাম কর।''[২৯]

অরণ্য-নিবিড় ভারতবর্ষের এক অপূর্ব রূপকল্প এখানে তৈরী হয়ে যায়। আরণ্যক এই প্রতীকী দেবী বঞ্চিতা ভারতবর্ষ। আর তারই সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য সন্ন্যাসী বীরেরা অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই এ উপন্যাসে অরণ্য নিছক নিসর্গ বা রোমান্টিকতার স্থান নয়, অরণ্য আরও প্রগাঢ় অর্থবাহী। এই অরণ্য 'সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যে গাছের ফল আর কেহ পায় না।'[৩০] দেশপ্রেমী সন্তানদের জন্য এই গভীর অরণ্য গাছে গাছে বন্য ফল ফলিয়ে রাখে। এই আরণ্যক পরিবেশ, অরণ্যচারী সন্ন্যাসীদের প্রভাব কল্যাণীকে নিয়ে যায় স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায়, যেখানে তিনি দেখেন 'অতি শীর্ণা, কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা' এক স্ত্রী-মূর্ত্তি কেঁদে বলছেন -কল্যাণীর জন্য মহেন্দ্র তাঁর কাছে যান। এই স্বপ্নময়ী নারী আসলে অবচেতনে কল্যাণীর মনে উদিতা ভারতবর্ষের ছবি। অরণ্য ছেড়ে মহেন্দ্র যখন স্ত্রীকন্যাকে নিয়ে নিজের গ্রামে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন, তখন কল্যাণী আসলে বিবেকযন্ত্রনায় ভুগছেন। সন্ন্যাসীদের মতো তাঁর স্বামীকেও দেশসেবার পথে উৎসর্গীকৃত হবার রাস্তায় তিনি বাধা হতে চাইছিলেন না। মহেন্দ্র ও কল্যাণীর কথোপকথনের ফাঁকে কল্যাণীর বিষের কৌটো থেকে খেলাচ্ছলে একটি বিষ-বড়ি তুলে নিয়ে তাদের কন্যা সুকুমারী খেয়ে ফেললো। কন্যাকে মৃত্যু-মুখে দেখে কল্যাণীও বিষ খেলেন। অরণ্যের কোলেই তিনি লুটিয়ে পড়লেন, আর এই সময়েই সন্ন্যাসী সত্যানন্দ অরণ্য-মধ্য থেকে গান গাইতে গাইতে এলেন, মনে হল সারা অরণ্য যেন তাঁর সাথে সাথে গান গাইছে। একদিকে গভীর অরণ্য, সেই পটভূমিতে ভূমিতে শায়িতা মৃত্যপথযাত্রী কল্যাণী,

সামনে শোকাকুল মহেন্দ্র। হরিগুণকীর্তনের গম্ভীর উচ্চারণে ('হরে মুরারে, মধুকৈটভারে .....') অরণ্যভূমি অন্যরকম হয়ে উঠল।

''তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশুপক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী - এই চরমগীতির উপযুক্ত মন্দির।''[৩১] অরণ্য এখানে মন্দির হয়ে উঠল।

প্রথম খন্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ-এ বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়কার বনগ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার বেশীর ভাগ গ্রামকে রুগ্ন, শীর্ণ করে তুললেও অরণ্য তার নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলোকে তার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। মানবজীবনে অরণ্য যে কত অপরিহার্য্য তা আমরা এই পরিচ্ছেদে আবার অনুভব করি। সন্ন্যাসী জীবানন্দ মহেন্দ্র-র কন্যাকে তাঁর বোনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অরণ্য থেকে তাঁর গ্রামে চললেন। বঙ্কিম লিখেছেন - ''গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে কতকগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল - জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম - কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমল তৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমল শ্যামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান, মাঝে নীলজলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস,ডাহুক, তীরে কোকিল, চক্রবাক, কিছু দূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকা ধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গনে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজকাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই - কাহার-ও চালে একটি ময়নার পিঁজরে, কাহারও দেওয়ালে আলপনা - কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষপীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে - জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।''[৩২] অরণ্যের কারণেই এই অরণ্য-নিকটবর্ত্তী গ্রামে মন্বন্তর তার প্রখরতায় হানা দিতে পারে নি। অরণ্যের কারণেই এ গ্রামে কিছুটা বৃষ্টিও হয়েছিল। জীবানন্দের জবানবন্দিতেই জানা গেছে 'বনে বৃষ্টি হয়।'

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অরণ্য মূলকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থেকেছে।

□সন্ন্যাসী জীবানন্দের স্ত্রী 'শান্তি' স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য অরণ্যে আসেন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে। কিন্তু ক্রমাগত এই আরণ্যক পরিবেশে সন্ন্যাসীদের আদর্শের প্রভাবে তিনিও 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রকে কণ্ঠে তুলে নেন।

□আবার এই আরণ্যক পরিবেশে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর সংযম স্খলিত হয়েছে। তাই ভবানন্দ কল্যাণীর দেহজ রূপে উদভ্রান্ত হন। -''দাহ ! কল্যাণী দাহ ! জ্বালা ! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন, তাহা আর নাই। প্রাণ যায় ! চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে ? ''[৩৩] কল্যাণীর দ্বারা অস্বীকৃত হয়ে ভবানন্দ অরণ্যের নির্জনতাকেই তাঁর confession-এর জায়গা হিসেবে বেছে নিলেন - ''মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গলমধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাগুল্মকন্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিষ্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

''রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতা, দুর্ভেদ্য, নীরব ! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি ও আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন,কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন, স্পন্দ নাই। নিঃশ্বাস নাই,ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন -'....আমি ভাগীরথীজলতরঙ্গসমীপে ক্ষুদ্র গজের মতো ইন্দ্রিয়স্রোতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহূর্ত্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে - দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস - আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম ? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্ম্মত্যাগী ? ছিঃ, মাধব !''[৩৪] ভবানন্দের এই আত্মপীড়নের করুণ মুহূর্তে অরণ্যই যেন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছে। নিজেকে তিনি সঁপে দিয়েছেন আরণ্যক স্তব্ধতায়। আর এই অরণ্য-অভ্যন্তর থেকেই হঠাৎ তিনি শুনলেন প্রবোধবাক্য - 'তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি

মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল, কে বলিল -'ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে - আশীর্ব্বাদ করিলাম।'[৫৫] ' বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে ' সকালবেলার সূর্য্যের পবিত্র আলো 'প্রতিভাসিত' হয়ে ভবানন্দের মনও আলোকিত হয়ে উঠল। একটি জীবন নষ্ট হয়ে যেতে যেতে ভালো হয়ে গেল, বেঁচে গেল। অরণ্য-গভীরে এ এক নিশ্চিত-উত্তরণ।

☐ এই অরণ্যই আবার সন্ন্যাসীদের গোপন সভার জায়গা, অরণ্য-নিবিড়ে বসে সন্তানেরা তাদের লড়াই-এর ছক করেন, সত্যানন্দ এখানেই তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন-কে সঞ্চারিত করেন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে - ''ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তানসম্প্রদায় নদীতীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্নারাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কাননমধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। ...দশ সহস্র নরকণ্ঠের কল কল রব, মধুর বায়ুসঞ্চারিত বৃক্ষপত্ররাশির মর্ম্মর, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিনীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরনীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম । আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজনমনোরম 'বন্দেমাতরম' ! ...সেই দশ সহস্র সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদপতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল।''[৫৬] অরণ্য এখানে এক মহতী সংগ্রামের শরিক। সবুজ গাছের আড়ালে, সবুজ ঘাসের বুকের উপর হাজার হাজার সংগ্রামী গভীরতর আত্মত্যাগের ব্রত গ্রহণ করছে। অরণ্যমধ্যে অবস্থিত 'আনন্দমঠের' সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অরণ্যভূমিই যেন এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

☐ যে মহেন্দ্র সিংহ জানতেন তাঁর স্ত্রী কল্যাণী বিষ খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর পুনর্মিলন হয় গভীর অরণ্যের মধ্যেই। এই আবেগঘন পুনর্মিলনকে প্রকৃত বর্ণনায় ধরে রাখতে বঙ্কিমচন্দ্র অরণ্য-প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। বহু ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে এক ভোরে অরণ্যের গভীরে মহেন্দ্র ও কল্যাণী মুখোমুখি হলেন। সাহিত্যসম্রাট এই মিলনকে ধরে রাখতে যেন মুহূর্তে এক রোমান্টিক কবি হয়ে উঠলেন -''সেই রজনী প্রভাতে শান্তির সাহায্যে মহেন্দ্র-এর সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তব্ধ কাননমধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শালতরুশ্রেণীর অন্ধকার ছায়ামধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র

হইবার পূর্বের, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী ম্লানকিরণ আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শিলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুরকল্লোলিনী, সংকীর্ণা নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত উষামুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।''[৩৮]

অরণ্যই এখানে বাঙ্ময় করে তুলেছে মহেন্দ্র ও কল্যাণীর মনের অনুভূতি ও উচ্ছাসগুলোকে। প্রকৃতির নানান উপকরণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দুই আবেগমথিত হৃদয়ের অনুভবকে শব্দময় করে তুলেছেন শিল্পীর মতো নিপুণতায়।

'কপালকুন্ডলা' ও 'আনন্দমঠ'-এ অরণ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ছাড়াও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে পটভূমি হিসেবে, 'ইন্দিরা'য় গল্পের প্রয়োজনে এবং 'দেবী চৌধুরানী'তে গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে অরণ্য এসেছে। এককথায় বলতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসে অরণ্যকে প্রথম নিয়ে এলেন এবং পরবর্তী অরণ্য-সাহিত্যের বীজও তিনিই রোপন করে গেলেন।

উল্লেখপঞ্জী

১) আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, ১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, পৃষ্ঠা-৫৩৭

২) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩৭

৩) সাহিত্যসাধক চরিতমালা, প্রথম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-২৭

৪) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রথম সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-৭৩-৭৪

৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৪

৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৫

৭) বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা-৭৫

৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৫

৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬

১০) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬

১১) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭

১২) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৮

১৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৭৯

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৮২

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৯৩

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৯১

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৯২

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৯০

২০) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৪

২১) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৫

২২) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৫

২৩) বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ১০৬

২৪) তদেব, পৃষ্ঠা-১০৬

২৫) তদেব, পৃষ্ঠা-১১২

২৬) বাংলা উপন্যাসের বালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্থ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০০, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা-৭৮

২৭) বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, নবম মুদ্রণ ১৩৯২, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ৫৮১

২৮) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮৪-৫৮৫

২৯) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯৩

৩০) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯৪

৩১) তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯৭

৩২) তদেব, পৃষ্ঠা-৬০০

৩৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৬২৩

৩৪) তদেব, পৃষ্ঠা-৬২৫

৩৫) তদেব, পৃষ্ঠা-৬২৫

৩৬) তদেব, পৃষ্ঠা-৬২৬-৬২৭

৩৭) তদেব, পৃষ্ঠা-৬৩৫